বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে।....

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, ... কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়। সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত, লুন, লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে। তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় ভূমে, গোহালের এক পাশে শয়ন করিবে— উহাদের মশা

লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে— যাইবার সময়, হয় জমীদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমীদার জমীখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস---সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চসমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরাজ বাহাদুর! ..... তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

..... দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়

জন? আর এই কৃষিজীবী কয় জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয় জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ---দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।.... যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোনও মঙ্গল নাই।"

[উদ্ধৃত অংশটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষ। মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মন্বন্তরের সমসাময়িক)।

ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন কৃষিজ ও
বাগিচা ফসল-মানচিত্র
উত্তর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ধান
চা
কফি
গম
চিনি
তুলো
ভুট্টা
পাট
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা

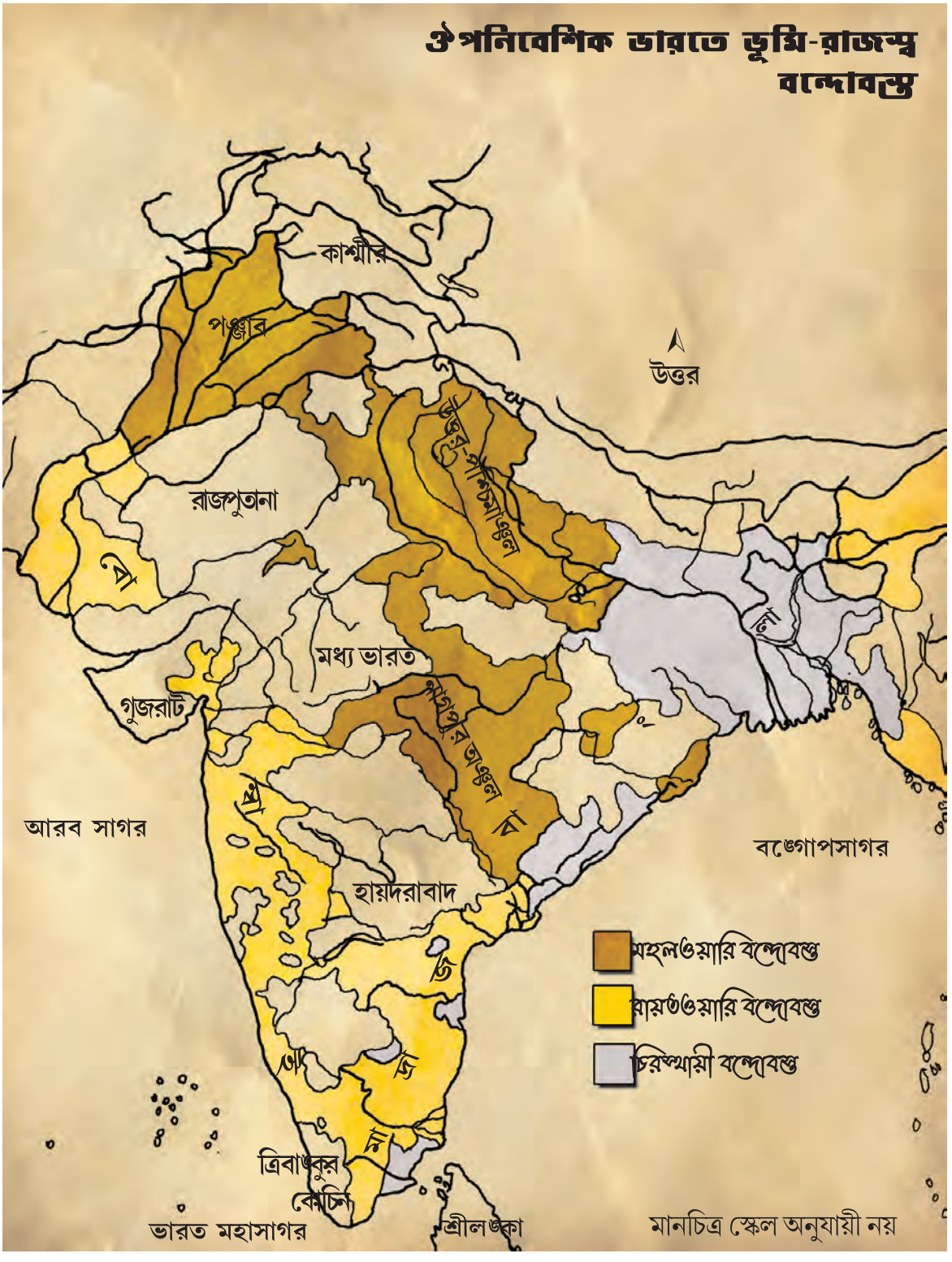

ঔপনিবেশিক ভারতে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত
কাশ্মীর
পঞ্জাব
উত্তর
রাজপুতানা
মধ্য ভারত
গুজরাট
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
হায়দরাবাদ
ত্রিবাঙ্কুর
কোচিন
ভারত মহাসাগর
শ্রীলঙ্কা
মহলওয়ারি বন্দোবস্ত
রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী নয়

ভেবে দেখো খুঁজে দেখো

১। ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন --- (হেস্টিংস/ কর্নওয়ালিস/ ডালহৌসি)।

খ) মহলওয়ারি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল --- (বাংলায়/ উত্তর ভারতে / দক্ষিণ ভারতে)।

গ) 'দাদন' বলতে বোঝায় — (অগ্রিম অর্থ/ আবওয়াব/ বেগার শ্রম)।

ঘ) ঔপনিবেশিক ভারতে প্রথম পাটের কারখানা চালু হয়েছিল — (রিষড়ায়/ কলকাতায়/ বোম্বাইতে)।

ঙ) দেশের সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়াকে বলে — (সম্পদের বহির্গমন/ অবশিল্পায়ন/ বর্গাদারি ব্যবস্থা)।

২। নীচের বিবৃতিগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল বেছে নাও :

ক) ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়।

খ) নীল বিদ্রোহ হয়েছিল মাদ্রাজে।

গ) দাক্ষিণাত্যে তুলো চাষের সঙ্গে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের বিষয় জড়িত ছিল।

ঘ) রেলপথের বিস্তারের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যে ভারতের বাজার ছেয়ে গিয়েছিল।

ঙ) টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা কোম্পানি-শাসনের কথা মাথায় রেখে বানানো হয়েছিল।

৩। অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০ - ৪০টি শব্দ) :

ক) 'সূর্যাস্ত আইন' কাকে বলে?

খ) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে কী বোঝো?

গ) 'দাক্ষিণাত্য হাঙ্গামা' কেন হয়েছিল?

ঘ) সম্পদের বহির্গমন কাকে বলে?

ঙ) অবশিল্পায়ন বলতে কী বোঝো?

৪। নিজের ভাষায় লেখো (১২০-১৬০ টি শব্দ) :

ক) বাংলার কৃষক সমাজের উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাব কেমন ছিল বলে তোমার মনে হয়?

খ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি বন্দোবস্ত গুলির তুলনামূলক আলোচনা করো। তিনটির মধ্যে কোনটি

কৃষকদের জন্য কম ক্ষতিকারক বলে তোমার মনে হয়? যুক্তি দিয়ে লেখো।

গ) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের সঙ্গে কৃষক-অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কী সরাসরি সম্পর্ক ছিল? সেই নিরিখে 'দাক্ষিণাত্যের হাঙ্গামা' কে তুমি কীভাবে বিচার করবে?

ঘ) বাংলার বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে কোম্পানির বাণিজ্যনীতির কী ধরনের সম্পর্ক ছিল? কেন দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বিমা কোম্পানি তৈরি করেন ভারতীয়রা?

ঙ) ভারতে কোম্পানি-শাসন বিস্তারের প্রেক্ষিতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার বিকাশের তুলনামূলক আলোচনা করো।

৫। কল্পনা করে লেখো (২০০টি শব্দের মধ্যে) :

ক) ধরো প্রথমবার তুমি রেলে চড়তে যাচ্ছ। রেলে চড়ার আগে এবং রেলে চড়ার পর তোমার অভিজ্ঞতা কেমন হয়েছে, তা বন্ধুকে চিঠি লিখে জানাও।

খ) ধরো তুমি ১৮৭০ -এর দশকে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের একজন বাসিন্দা। ঐ অঞ্চলের কৃষকদের তুলোচাষকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের বিবরণ তোমার ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখে রাখো।

৫ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া : সহযোগিতা ও বিদ্রোহ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন ভারতের সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের যে সব উদ্যোগ নিয়েছিল তাতে ভারতীয় সমাজের এক অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সাহায্যে অনেক ভারতীয়ই সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এইসব ভারতীয়দের অধিকাংশ ব্রিটিশ কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ইংরাজি শিক্ষার

ওল্ড কোর্ট হাউস ও রাইটার্স' বিল্ডিং, কলকাতা। মূল ছবিটি থমাস দানিয়েল-এর আঁকা (আনু. ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ)

সুফল পেয়েছিলেন। এঁদের অনেকেই কোম্পানির অর্থনৈতিক কার্যকলাপেও সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তার ফলে ঊনবিংশ শতকের ভারতে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারকেরা সাধারণত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আদর্শের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসনের সহগামী হিসেবেই দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সম্ভব।

ঐ ভারতীয়রা মনে করতেন ইংরেজি ভাষা শিখতে পারলে তাঁদের নিজেদের ও তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ তৈরি হবে এবং চাকরি পেতে সুবিধা হবে। অন্যদিকে ব্রিটিশ

কোম্পানিও বুঝতে পারছিল যে, শাসন সংক্রান্ত কাজকর্ম চালাতে সব সময় সুদূর ইংল্যান্ড থেকে লোক আনার খরচ অনেক বেশি। বরং ভারতীয়দের মধ্যে থেকে ঘষে-মেজে এমন একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে তোলা দরকার যারা রুচি ও মতের দিক থেকে ইংরেজ- অনুগামী হবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত ভারতীয়রা সবাই ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি সমান অনুগত ছিলেন না। সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের নানা বিষয়কে ঘিরে মাঝেমধ্যেই বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিত। এর পাশাপাশি

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনকে ঘিরে সরাসরি বিক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। সেই বিক্ষোভগুলি প্রায়ই ছোটোবড়ো বিদ্রোহের আকার নিত। যদিও শিক্ষিত মানুষেরা অনেকসময় ঐ বিদ্রোহ-বিক্ষোভগুলির সমালোচনা করেছিলেন।

আর্থিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রে যাঁরা মাঝামাঝি স্তরে থাকেন, সাধারণভাবে তাঁদেরকে মধ্যবিত্ত বলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত উচ্চবর্ণের ঐ মধ্যবিত্তদের ব্রিটিশ-ভারতে 'ভদ্রলোক' বলেও উল্লেখ করা হতো। এই নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে সামাজিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়। কলকাতা, বোম্বাই ও

মাদ্রাজের মতো শহরকে কেন্দ্র করেই এই ভদ্রলোকদের সংস্কারমূলক উদ্যোগগুলি গড়ে উঠেছিল।

বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন : সতীদাহ রদ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন

প্রথম দিকের কোম্পানি শাসকরা ভারতীয় সমাজ বিষয়ে মূলত নিরপেক্ষ নীতি নিতেন। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু কিছু সামাজিক সংস্কার বিষয়ক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়। নৃশংস, অমানবিক কিছু রীতিনীতি বন্ধ করতে আইন প্রণীত হয়। তবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন সংস্কারমূলক আইন জারি করা

হলেও কুপ্রথাগুলি রয়েই গিয়েছিল। যেমন, ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি সাগরে কন্যাশিশু ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাতে করে ঐ প্রথা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি।

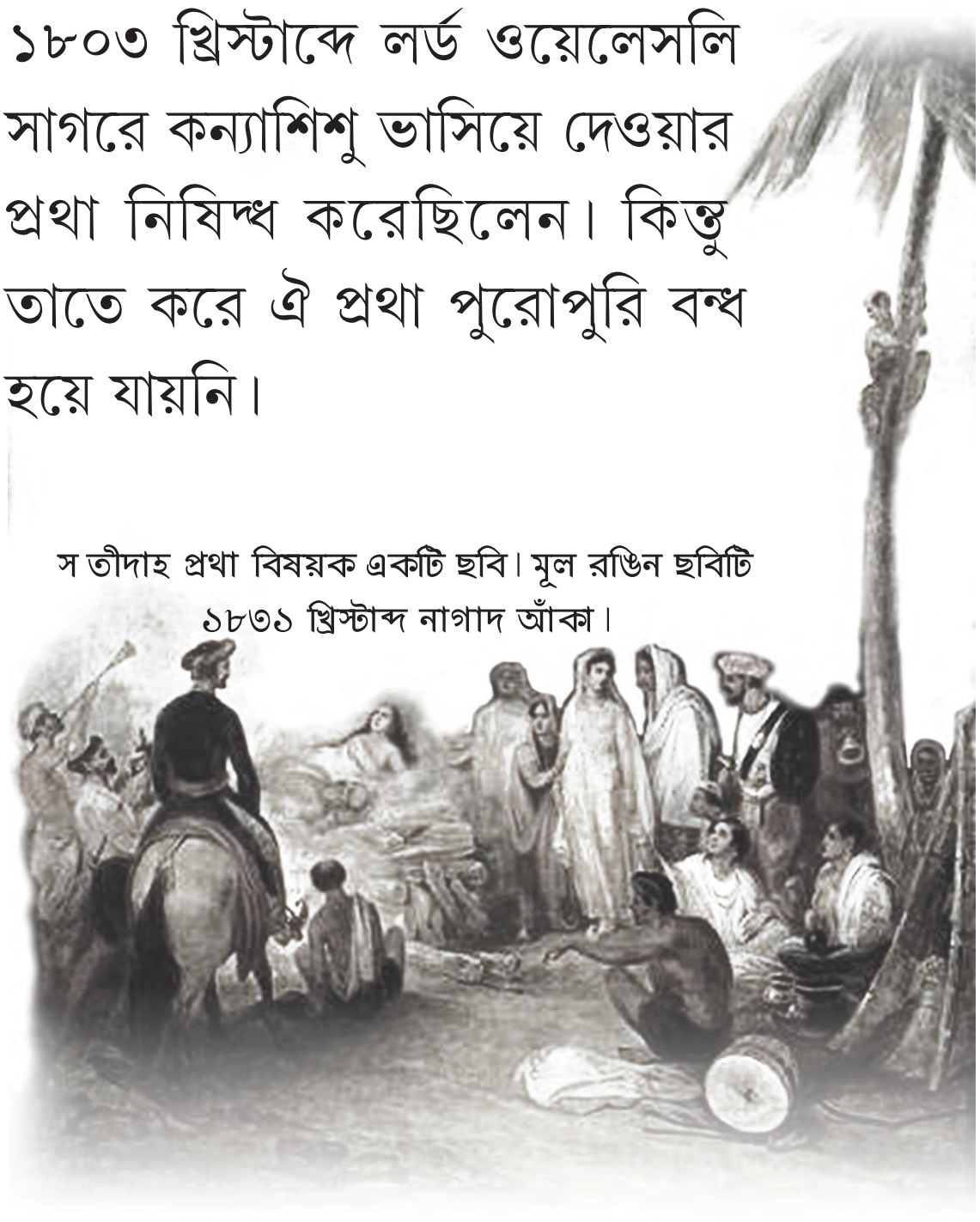

সতীদাহ প্রথা বিষয়ক একটি ছবি। মূল রঙিন ছবিটি ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা।

HICKY's
BENGAL GAZETTE:
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertifer.
সমাচার দর্পণ

টুকরো কথা

সংবাদপত্র ও জনমত গঠন

ভারতীয় জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্র- গুলির অবদান অপরিসীম। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ব্যবসায়ী জেমস অগাস্টাস হিকি বেঙ্গল গেজেট নামে প্রথম একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ভাবে সংবাদ পরিবেশনের ফলে হিকি কোম্পানি প্রশাসনের বিরাগ- ভাজন হন। শ্রীরামপুরের মিশনারি মার্শম্যানের সম্পাদনায়

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা দিগদর্শন ও সাপ্তাহিক পত্রিকা সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের অনেকেই বিভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ঊনবিংশ শতকে শিক্ষিত ভদ্রলোক ভারতীয়দের অনেকেই সমাজ সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হন। বাংলায় ঐ আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। যুক্তিসম্মত বিচারের সাহায্যে তিনি হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করার কথা বলেছিলেন। তিনি মূর্তিপুজো, পুরোহিততন্ত্র এবং বহু ঈশ্বরবাদের নিন্দা করেন। সতীদাহ প্রথার নিষিদ্ধকরণে তাঁর উদ্যোগ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকেও কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে সতীদাহ প্রথা বজায় ছিল।

রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার পক্ষে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। যদিও সতীপ্রথাকে নিয়ে নানানরকম গৌরবময় ধারণা সমাজে রয়েই গিয়েছিল। সম্পত্তিতে নারীর আইনগত স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও রামমোহন সওয়াল করেন।

টুকরো কথা

সতীদাহ রদ বিষয়ে রামমোহনের সওয়াল

"প্রবর্ত্তক।—স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবাতে আগ্রহের কারণ ..... যে স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র,

সানুরাগা, এবং ধর্ম্মজ্ঞানশূন্যা হয়। ..... সুতরাং সহমরণ না করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা, ... এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া যায়, যে সহমরণ করিলে স্বামীর সহিত স্বর্গ ভোগ হয়, এবং তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত মহাযশ আছে, যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বামী মরিলে অনেকেই সহমরণ করিতে অভিপ্রায় করে, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে চিতাভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা যায়।

নিবর্ত্তক।—..... কিন্তু স্ত্রীলোককে যে পর্য্যন্ত দোষান্বিত আপনি কহিলেন, তাহা স্বভাবসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকত ধর্ম্মত বিরুদ্ধ হয়, ...।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা

কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?"

[উদ্ধৃত অংশটি রামমোহন রায়-এর 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' রচনা থেকে নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় বিধবা নারীদের পুনরায় বিয়ে দেওয়া নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রামমোহনের মতো বিদ্যাসাগরও ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে আইন জারি করে বিধবা বিবাহ চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন জারি করা হয়। কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে মোটেই বিধবা বিবাহ জনপ্রিয় হয়নি। বরং বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকটি বিধবা বিবাহ আয়োজন করা হয়েছিল।

টুকরো কথা

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের যুক্তি

‘‘বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন। অনেকে তত দূর পর্যন্ত যাইতে

সাহস করিতে পারে না; কিন্তু, এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। .....

.....

....বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলা কোনও ক্রমেই শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। অতএব, কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে সর্বপ্রকারেই কর্তব্য কর্ম, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় অথবা আপত্তি হইতে পারে না।....”

[উদ্ধৃত অংশটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর ‘বিধবা বিবাহ’ রচনা (১৬ মাঘ, সংবৎ ১৯১১) থেকে নেওয়া হয়েছে। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

বাংলায় শিক্ষা সংস্কার : ডিরোজিও ও নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নারী শিক্ষা

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন কলকাতার হিন্দু কলেজের শিক্ষক। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের নব্যবঙ্গ বা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী বলা হতো। বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর সদস্যরা মতামত প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া জাতপাত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথার বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ও

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর পুরো সমর্থন ছিল। পরবর্তীকালে ঐ গোষ্ঠীর অনেক সদস্যই নিজেদের পুরোনো মতামত ও অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে বাংলায় প্রায় একক উদ্যোগে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজে পড়ানোর সময় থেকেই শিক্ষা সংক্রান্ত নানান সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর উদ্যোগেই ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পরিবারের ছেলেদের পাশাপাশি কায়স্থ ছেলেরাও সংস্কৃত কলেজে পড়ার সুযোগ পায়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার পাশাপাশি উপযুক্ত ইংরেজি শিক্ষার দরকারও অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন

মাতৃভাষা ও ইংরেজির মধ্যে সংযোগসাধন দরকার। ১৮৫০-এর দশকে ছাত্রদের পড়ার জন্য অনেকগুলি বই লেখেন বিদ্যাসাগর। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় লেখা আধুনিক গণিতের চর্চাও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন তিনি। সহকারি স্কুল পরিদর্শক হিসেবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি মডেল স্কুল তৈরি করেন বিদ্যাসাগর। তিনি বুঝেছিলেন যে সরকারি তরফে যে সামান্য টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়, তা দিয়ে সমস্ত মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষা বিষয়ে ঔপনিবেশিক সরকারের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা উচিত বলে মনে করতেন বিদ্যাসাগর।

নারীদের শিক্ষাবিস্তারের প্রতিও বিদ্যাসাগর নজর দিয়েছিলেন। বেথুন স্কুলে যাতে মেয়েরা পড়তে যায় তার জন্য তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্কুল পরিদর্শকের কাজ করার সময় নিজের খরচে অনেকগুলি মেয়েদের স্কুল তৈরি করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা সেই স্কুলগুলিতে অনেক মেয়েই পড়াশুনা করত।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে আঁকা একটি ছবি। মূল ছবিটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর আঁকা।

ভারতের অন্যত্র সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

১৮৪০-এর দশক থেকে মহারাষ্ট্রে তথা পশ্চিম ভারতে বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের পক্ষে মতামত তৈরি হতে থাকে। ক্রমেই ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে বিধবা বিবাহের উদ্যোগ দেখা যায়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিতের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহের পক্ষে একটি সভা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে আত্মারাম পাণ্ডুরং ও মহাদেব গোবিন্দ রানাডের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ সামাজিক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিল।

পণ্ডিতা রমাবাঈ

টুকরো কথা

নারীশিক্ষা ও পণ্ডিতা রমাবাঈ

উনিশ শতকে নারীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু নারীও উদ্যোগী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে পশ্চিমভারতে পণ্ডিতা রমাবাঈ, মাদ্রাজে ভগিনী শুভলক্ষ্মী ও বাংলায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে ব্রিটিশ প্রশাসন মেয়েদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য বিভিন্ন অনুদান ও বৃত্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। তার ফলে নারীশিক্ষার কিছুটা বিকাশ ঘটে।

পণ্ডিতা রমাবাঈ ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল। সমস্ত সামাজিক বাধা নস্যাৎ করে তিনি

এক শূদ্রকে বিয়ে করেন। পরে বিধবা অবস্থায় নিজের মেয়েকে নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে ডাক্তারি পড়েন রমাবাঈ। বিধবা মহিলাদের জন্য তিনি একটি আশ্রম তৈরি করেছিলেন। তবে রমাবাঈয়ের উদ্যোগকে রক্ষণশীলদের অনেকেই সমালোচনা করেছিলেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে বীরেশলিঙ্গম পান্তুলুর নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু হয়। পান্তুলু বাংলার ব্রাহ্ম আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মূর্তিপুজো, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ও বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিরোধিতা করেছিলেন বীরেশলিঙ্গম। পাশাপাশি নারী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহের পক্ষেও সওয়ান করেন পান্তুলু। তিনি দক্ষিণ ভারতে প্রার্থনা সমাজের সংস্কার

আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাদ্রাজে শিক্ষিত নাগরিকদের অনেকেই ঐ আন্দোলনের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও সামান্য কয়েকটি বিধবা বিবাহ বাস্তবায়িত হয়েছিল।

বোম্বাইয়ের একটি মেয়েদের স্কুল। মূল ছবিটি উইলিয়ম সি স্পস ন-এর আঁকা (আনু. ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ)।

টুকরো কথা

জ্যোতিরাও ফুলে

মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জ্যোতিরাও ফুলে ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী বাঈ-এর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাঁরা লড়াই করেছিলেন। পুনা শহরে তাঁরা ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে নারীশিক্ষা প্রসারে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহ প্রচলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। জ্যোতিরাও ফুলের 'সত্যশোধক সমাজ' নীচুতলার মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই করত। তবে জ্যোতিরাও ফুলের উদ্যোগ সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিশেষ সফল হয়নি।

ধর্ম সংস্কার : ব্রাহ্ম আন্দোলন ও হিন্দু পুনরুজ্জীবন

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন রামমোহন রায়। মূলত সামাজিক সংস্কার করাই ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে আত্মীয় সভা থেকে ব্রাহ্ম সমাজ গড়ে ওঠে। রামমোহনের পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন। ১৮৬০-এর দশকে কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উদ্যোগে কলকাতার শিক্ষিত সমাজের গণ্ডি পেরিয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয় ঐতিহ্য এবং ব্রাহ্ম ধারণার মধ্যে সংযোগ তৈরি করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু আদতে সমাজের উচ্চবর্গের

মধ্যেই ব্রাহ্ম আন্দোলন সীমিত ছিল। ফলে ধর্ম সম্পর্কে ব্রাহ্মদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি উগ্র নব্যহিন্দু ধর্মপ্রচারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি।

টুকরো কথা

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও আর্য সমাজ

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। বেদকে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে চূড়ান্ত বলে মনে করতেন দয়ানন্দ। তার মতে বেদের মধ্যেই নাকি সমস্ত বিজ্ঞানের কথা নিহিত রয়েছে। পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সমস্ত আচার ও সংস্কার মিশে গিয়েছিল সেগুলির সমালোচনা করেন দয়ানন্দ। মূর্তিপুজো, পুরোহিতদের প্রাধান্য ও বাল্যবিবাহের মতো বিষয়গুলি দয়ানন্দের সমালোচনার লক্ষ্য ছিল। পাশাপাশি বিধবা বিবাহ ও নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন তিনি। পঞ্জাব ও

উত্তর-পশ্চিম ভারতে আর্য সমাজ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু দয়ানন্দের মৃত্যুর পর আর্য সমাজ আন্দোলন উগ্র হিন্দু রূপ ধারণ করতে থাকে।

বাংলায় ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের সংস্কার আন্দোলনে হিন্দু পুনরুজ্জীবনের ছাপ দেখা যায়। রাজনারায়ণ বসুর জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা এবং নবগোপাল মিত্রে জাতীয় মেলা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। জাতীয় মেলা পরে হিন্দুমেলা নামে পরিচিত হয়। হিন্দুধর্মের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের আদর্শে সকলকে উজ্জীবিত করাই ছিল হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ

পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। উনিশ শতকের চাকরিজীবী শহুরে শিক্ষিত মানুষের কাছে রামকৃষ্ণের এক বিশেষ আবেদন তৈরি হয়েছিল। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি সহজভাবে ও ভাষায় ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। বিবেকানন্দ নারীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

সংস্কার আন্দোলনগুলির চরিত্র ও সীমাবদ্ধতা

কেশবচন্দ্র সেন

উনিশ শতকের এইসব সামাজিক সংস্কারগুলি গোড়া থেকেই সংকীর্ণ সীমানায় আটকা পড়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে আর্থিক ও শিক্ষাগত সুযোগ সুবিধাগুলি মূলত উচ্চবর্গের ভদ্রলোক ব্যক্তিরাই পেয়েছিলেন।

এই ভদ্রলোকেরাই ব্রাহ্ম আন্দোলনের মতো সংস্কার আন্দোলনগুলির পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন। কলকাতার বাইরে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়লেও সমাজের সাধারণ জনগণের সঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তাছাড়া সংস্কারকরাও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে বিশেষ ভাবিত ছিলেন না। মূলত ইংরেজি ও সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতেন বাংলার সমাজ সংস্কারকরা। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও প্রার্থনা সমাজের সামাজিক ভিত্তি

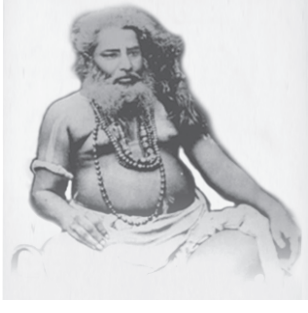

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে আটকে ছিল। পাশাপাশি এই সংস্কার আন্দোলনগুলি জাতিভেদ নিয়ে বিশেষ সোচ্চার হয়নি। কারণ সংস্কারকদের অধিকাংশই উঁচু জাতির প্রতিনিধি ছিলেন।

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই মনে করতেন যে, ধর্মশাস্ত্রে যে সব আচরণের কথা বলা আছে সেগুলি পালনীয়। তাঁরা মনে করতেন কিছু স্বার্থপর মানুষ নিজেদের স্বার্থে ধর্মশাস্ত্রগুলির অপব্যাখ্যা করে। দেশের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ সেসব শাস্ত্র কখনও পড়েনি। ফলে শাস্ত্রের নামে বিভিন্ন কুপ্রথার শিকার হতো তারা। এই মনোভাবের ফলে সমাজ সংস্কারকরা বিভিন্ন শাস্ত্রের সঠিক ব্যাখ্যা

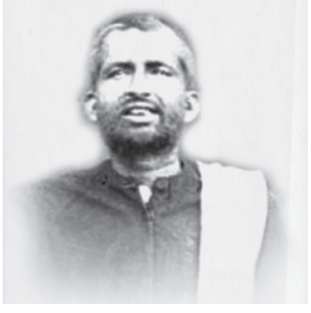

রামকৃষ্ণ পরমহংস

করার উদ্যোগ নেন। সতীদাহ বন্ধের ও বিধবা বিবাহ চালুর পক্ষে আন্দোলনগুলি গোড়া থেকেই ছিল শাস্ত্র-নির্ভর। রামমোহন রায় বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে নজির দিয়ে সতীদাহের বিপক্ষে সওয়াল করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলে তুলে ধরেছিলেন। বিভিন্ন প্রথার নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার বদলে ঐ প্রথাগুলি শাস্ত্রসম্মত কি না, তা নিয়ে আলোচনায় বেশি জোর পড়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ

মুসলিম সমাজে সংস্কার প্রক্রিয়া : আলিগড় আন্দোলন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মুসলমান সমাজেও বিভিন্ন সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মহামেডান লিটেরারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা তারই প্রমাণ। মুসলমান সংস্কারকদের মধ্যে স্যর সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন সবথেকে অগ্রগণ্য। চাকরির সুবাদে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্যর সৈয়দ। ফলে মুসলমান সমাজেও ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা জনপ্রিয় করার জন্য উদ্যোগ নেন তিনি। তার পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞানের বই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হতে থাকে। আধুনিক যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে কোরানকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ। পুরোনো প্রথা ও যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছিলেন তিনি। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আলিগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল

কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন স্যর সৈয়দ। মুসলমান ছাত্র-শিক্ষকদের পাশাপাশি বেশ কিছু হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষক ঐ কলেজে পড়াশুনার চর্চা করতেন।

তবে মুসলমান সমাজে সবাই স্যর সৈয়দের সংস্কারগুলি সমর্থন করেনি। পাশাপাশি স্যর সৈয়দ আহমদের সংস্কার প্রক্রিয়াগুলি সীমিত চরিত্রের ছিল। বিরাট সংখ্যক গরিব মুসলমানদের উপর ঐসব সংস্কারের কোনো প্রভাব পড়েনি। মূলত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমানরাই ঐ সংস্কারগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

নিজে করো

তোমার স্থানীয় অঞ্চলে সাক্ষরতার হার কেমন? কী কী ব্যবস্থা নিলে তোমার অঞ্চলে সাক্ষরতার প্রসার হবে, তা নিয়ে স্কুলে একটি পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করো।

কৃষক ও উপজাতি সমাজের বিদ্রোহ

আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশ কোম্পানি প্রশাসন ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নানারকম রদবদল করেছিল। সেই পরিবর্তনগুলির সরাসরি প্রভাব কৃষক ও উপজাতি সমাজের উপর পড়েছিল। তার ফলে আঠারো শতকের শেষ থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে কৃষক ও উপজাতি মানুষজন ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

পাশাপাশি কৃষক ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষরা একজোট হয়ে স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধেও আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। যদিও ব্রিটিশ প্রশাসনের ও অনেক ভদ্রলোকের চোখে

ঐ আন্দোলন ও বিদ্রোহগুলি নিছক 'আইন শৃঙ্খলার সমস্যা' বলে মনে হতো। উপজাতি-বিদ্রোহগুলিকে 'অসভ্য আদিম মানুষদের বিদ্রোহ' বলে খাটো করা হতো। কিন্তু বাস্তবে ঐ সব বিদ্রোহগুলি ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের উদাহরণ।

সাঁওতাল হুল (১৮৫৫-'৫৬ খ্রিঃ)

ঔপনিবেশিক শাসক, জমিদার, ইজারাদার ও মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের পাশাপাশি বিভিন্ন উপজাতিরা বিদ্রোহ করেছিল। ১৮৫৫-'৫৬ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাঁওতালদের এলাকায় জমিদার, বহিরাগত মহাজন (যাদের দিকু বলা হতো) প্রভাব বিস্তার করে। দরিদ্র সাঁওতালরা দিকুদের অত্যাচারের মুখে পড়ে। ইউরোপীয়

কর্মচারীরা সাঁওতালদের জোর করে রেলপথ তৈরির কাজে লাগাত এবং অত্যাচার করত। সবচেয়ে বড়ো কথা সাঁওতালদের নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হচ্ছিল।

এই ভয়াবহ জীবন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাঁওতালরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রথমদিকে সাঁওতালরা মহাজন, জমিদার ও ব্যবসায়ীদের বাড়ি-কুঠি আক্রমণ করেছিল। পরে সাঁওতালরা তাদের বিদ্রোহ (হুল) সংগঠিত করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সিধু, কানহু, চাঁদ ও ভৈরব। ভাগলপুর থেকে রাজমহল এলাকায় বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসন নির্মমভাবে সাঁওতালদের আক্রমণ করে। সিধু ও কানহুসহ হাজার হাজার

সাঁওতালদের হত্যা করা হয়েছিল। তবে এই বিদ্রোহ পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়নি। ব্রিটিশ প্রশাসন উপজাতিদের স্বার্থ ও সুরক্ষার ব্যাপারে কিছুটা সচেতন হয়েছিল। সাঁওতালদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল সাঁওতাল পরগনা।

প্রতিবাদী ভারতবাসী। মূল ছবিটি চিত্ত প্রসাদ ভট্টাচার্য-র আঁকা।

টুকরো কথা

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও হিন্দু প্যাট্রিয়ট

সাঁওতাল বিদ্রোহের খবর কলকাতায় পৌঁছানোর পরে শিক্ষিত হিন্দু বাঙালিদের অনেকেই ঐ বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ প্রশাসনের দমন-পীড়নের বিরোধিতাও তাঁরা করেননি। এর অন্যতম ব্যতিক্রম ছিলেন হিন্দু প্যাট্রিয়ট সংবাদপত্রের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হরিশচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে অর্থনৈতিক শোষণই সাঁওতালদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছিল। তাঁর পত্রিকায় হরিশচন্দ্র লিখেছিলেন, শান্ত ও সৎ সাঁওতাল জাতির বিদ্রোহ করার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। শোনা গিয়েছে যে, সাঁওতালদের

জোর করে বেগার খাটানো হয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত খাজনা দিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। হরিশচন্দ্র বলেন, যারা শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের উপর অত্যাচার করে তাদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছে, তাদেরই শাস্তি হওয়া উচিৎ। সাঁওতালদের শাস্তি প্রাপ্য নয়। সাঁওতালরা শুধু চায় নিজেদের জঙ্গল ও উপত্যকার মধ্যে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার।

রাজমহলের একটি সাঁওতাল গ্রাম। মূল ছবিটি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কাঠখোদাই করে আঁকা।

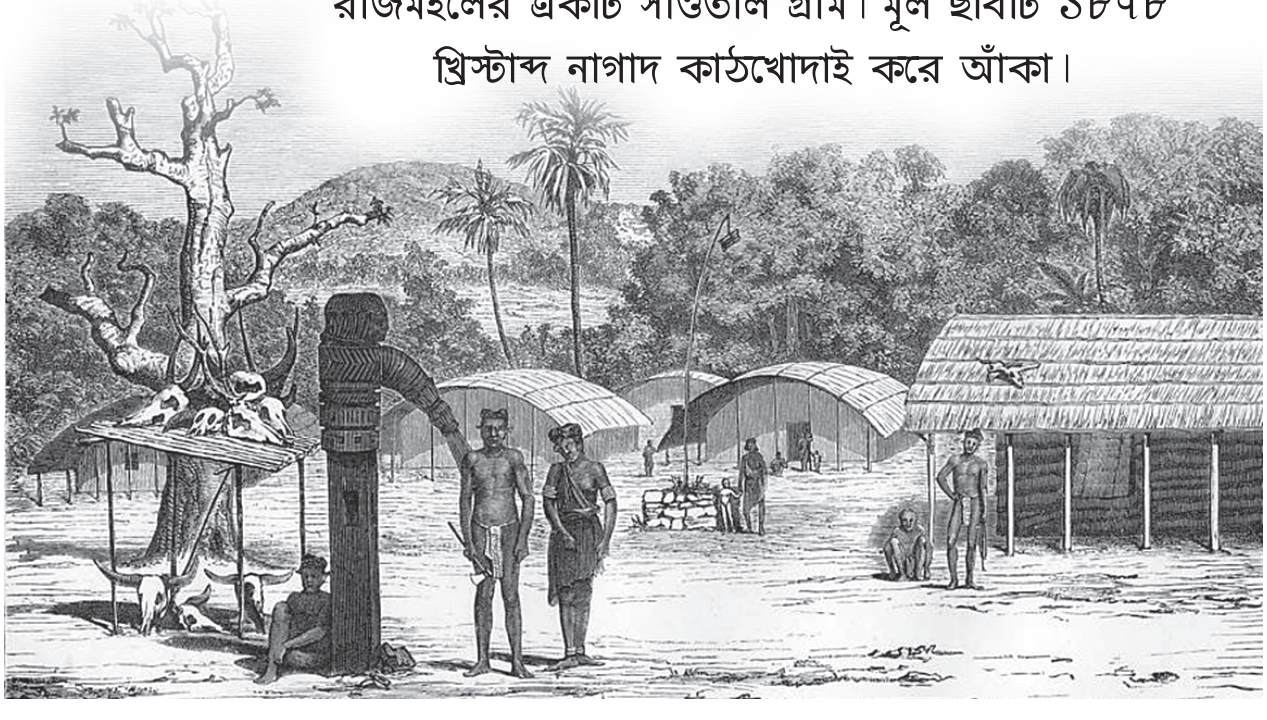

টুকরো কথা

মালাবারের মোপালা বিদ্রোহ

দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে কৃষকেরা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম মোপালা বিদ্রোহ। মোপালাদের অনেকেই ছিলেন কৃষি শ্রমিক, ছোটো ব্যবসায়ী ও জেলে। ব্রিটিশরা মালাবার দখল করার পর সেখানের গরিব কৃষকদের ওপর রাজস্বের বোঝা ও বিভিন্ন বেআইনি কর চাপিয়ে দিয়েছিল। পাশাপাশি জমিতে কৃষকদের অধিকারও অস্বীকার করা হয়। এসবের ফলে মালাবার অঞ্চলে একের পর এক বিদ্রোহ হয়েছিল। বিদ্রোহগুলি দমন করার জন্য ঔপনিবেশিক প্রশাসন সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করেছিল।

ওয়াহাবি আন্দোলন ও বারাসাত বিদ্রোহ

ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা হয় আরবে, আব্দুল ওয়াহাব-এর নেতৃত্বে। ভারতবর্ষে ওয়াহাবি আন্দোলন পরিচলানা করেন রায়বেরিলি অঞ্চলের সৈয়দ আহমদ নামের এক ব্যক্তি। তিনি ওয়াহাবিদের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সংঘবদ্ধ করেন। বারাসাত অঞ্চলের মির নিসার আলি (তিতুমির) ওয়াহাবি মতামতে অনুপ্রাণিত হন। তিতুমিরের নেতৃত্বেই নারকেলবেড়িয়া অঞ্চলে ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু হয়। নদিয়া, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও ওয়াহাবি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

তিতুমিরের আন্দোলন স্থানীয় জমিদার, নীলকর ও ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। বিদ্রোহ শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই তিতুমির ঘোষণা করেন কোম্পানি সরকারের শাসন শেষ হয়ে আসছে। বারাসাত অঞ্চলে একটি বাঁশের কেল্লা বানিয়ে নিজে বাদশাহ উপাধি নেন তিতু। নারকেলবেড়িয়া বা বারাসাত বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্রিটিশ- বাহিনী কামান দেগে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করে দেয় (১৮৩১ খ্রি:)।

টুকরো কথা

ফরাজি আন্দোলন

পূর্ববাংলার ফরিদপুর অঞ্চলে হাজি শরিয়তউল্লা গরিব চাষিদের নিয়ে ফরাজি আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফরাজি মতামতের প্রসারের ফলে

স্থানীয় জমিদারেরা ভয় পেয়েছিল। বারাসাত বিদ্রোহের মতোই ফরাজি আন্দোলনেও জমিদার, নীলকর ও ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বিরোধিতা করা হয়েছিল। ফরাজি আন্দোলন ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত চলেছিল।

মুন্ডা উলগুলান

উপজাতীয় কৃষক বিদ্রোহে অন্যতম বড়ো উদাহরণ ছিল বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৯-১৯০০ খ্রি:)। মুন্ডাদের জমি ধীরে ধীরে বহিরাগত বা দিকুদের হাতে চলে যায়। পাশাপাশি জমিদার, মহাজন, খ্রিস্টান মিশনারি ও ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি মুন্ডা কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। মুন্ডারা বিশ্বাস করত তাদের নেতা বিরসা নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

বিরসার আন্দোলন কেবল দিকুদের বিতাড়নেই থেমে থাকেনি। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিরসার শাসন প্রতিষ্ঠা করা মুন্ডা উলগুলানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তবে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দমন-পীড়নের ফলে মুন্ডা উলগুলান পরাস্ত হয়।

নীল বিদ্রোহ

১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় নীল চাষ ও নীলকরদের অত্যাচারকে কেন্দ্র করে নীল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহের দু-জন নেতা ছিলেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। নীল বিদ্রোহের পক্ষে বাংলার শিক্ষিত জনগণের অনেকেই নানাভাবে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছিলেন।

খ্রিস্টান মিশনারি রেভারেন্ড জেমস লং নীল বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও সোমপ্রকাশ পত্রিকা নীলচাষিদের পক্ষে দাঁড়ায়। এসবের ফলে নীলকরদের উপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নীল বিদ্রোহ শেষ হয়ে যায়। পাশাপাশি বাংলা থেকে নীল চাষও ততদিনে প্রায় উঠে গিয়েছিল।

টুকরো কথা

নীল বিদ্রোহ ও হিন্দু প্যাট্রিয়ট

বাংলার নীল বিদ্রোহের প্রতি হিন্দু প্যাট্রিয়ট সংবাদপত্র ও তার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহমর্মী অবস্থান নিয়েছিলেন। হরিশচন্দ্র নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষিদের পক্ষ নিয়ে লেখা শুরু করেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য তিনি শিশির কুমার

ঘোষ ও মনমোহন ঘোষকে নিয়োগ করেন। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে হরিশচন্দ্র লেখেন যে, বাংলায় নীলচাষ একটি সংগঠিত জুয়াচুরি ও নিপীড়ন-ব্যবস্থা মাত্র। হরিশচন্দ্র আরও লেখেন যে, নীল চাষে চাষির লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি। যে চাষি একবার নীল চাষ করেছে, তার আর বেঁচে থাকতে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই। কোনো চাষি নীলকরের বিরোধিতা করলে, তাকে অত্যাচারিত হতে হয়। নীলকর কোনো নীলচাষিকেই ন্যায্য দাম দেয় না। বস্তুত, হরিশচন্দ্রের উদ্যোগেই নীল বিদ্রোহের খবরাখবর বাংলায় শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ব্রিটিশ কোম্পানি কিভাবে সেনাবাহিনী তৈরি করেছিল তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে (তৃতীয় অধ্যায়ের ৪১ নং পৃষ্ঠা দেখো)। সেই সময় থেকেই সেনাবাহিনীতে নানান রকম জাতিপরিচয়কে উশকে দিত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ১৮২০-র দশক থেকে ক্রমশ সেনাবাহিনীতে নানান রকম সংস্কার করা হতে থাকে। তার ফলে জাতিগত সুযোগ-সুবিধার বদলে সমস্ত সেনা বাহিনীকে একই ছাঁচে ঢালার চেষ্টা হতে থাকে। তার ফলে সেই সময় থেকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে বিরোধিতা শুরু হয়।

ঐ অসন্তোষের পটভূমির মধ্যে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ঐ বছরের

গোড়ার দিকে কলকাতার দমদম সেনাছাউনির সিপাহিদের মধ্যে বন্দুকের টোটা নিয়ে গুজব ছড়িয়ে যায়। বলা হতে থাকে যে, নতুন এনফিল্ড রাইফেলের টোটাগুলিতে নাকি গোরু ও শূকরের চর্বি মেশানো রয়েছে। ঐ টোটাগুলি রাইফেলে ভরার আগে দাঁত দিয়ে কেটে নিতে হতো। তার ফলে সিপাহিদের মনে বিশ্বাস তৈরি হয় যে, কোম্পানি ষড়যন্ত্র করে তাদের জাত ও ধর্ম নষ্ট করার চেষ্টা করছে। যদিও ঐ গুজবটি খানিকটা ঠিকই ছিল। দ্রুতই সারাদেশের সেনাছাউনিতে গুজবটি ছড়িয়ে পড়ে। সঙেগ সঙেগ সতর্ক হয়ে ব্রিটিশ কোম্পানি ঐ টোটা বানানো বন্ধ করে দেয়। সিপাহিদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কোম্পানি-শাসনের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও করা হয়।

কিন্তু সিপাহিদের বিশ্বাস যে ভেঙে গিয়েছিল, তার প্রমাণ খুব তাড়াতাড়িই পাওয়া যায়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ দিকে ব্যারাকপুরের সেনাছাউনিতে সিপাহি মঙ্গল পান্ডে এক ইউরোপীয় সেনা আধিকারিককে গুলি করেন। মঙ্গলের সহকর্মীরা কর্তৃপক্ষের আদেশ পেয়েও মঙ্গলকে গ্রেফতার করেননি।

মিরাটে সি পাহিদের বিদ্রোহ। মূল ছবিটি ইলাস ট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ)।

দ্রুতই তাঁদের সকলকে গ্রেফতার করে ফাঁসির বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু এর পর থেকে দেশের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ ফুটে বেরোতে থাকে। আম্বালা, লখনৌ, মিরাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানারকম গোলযোগের খবর পাওয়া যায়। মে মাসের মাঝামাঝি মিরাটের সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শুরু হয় কোম্পানির বিরুদ্ধে সিপাহিবাহিনীর বিদ্রোহ।

টুকরো কথা

গোরে আয়ে

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ মে। বিকাল তখন শেষ হয়ে আসছে। উত্তরপ্রদেশের মিরাটের সেনাছাউনির কাছে বাজারে বসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিপাহিরা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে

আলোচনা করেছিল। আগের দিন কলোনেল কারমাইকেল স্মিথ ৮৫ জন সিপাহিকে জেলে আটক করেছেন। সাধারণ অপরাধীদের মতোই তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ ব্যবহার করতে চায়নি। এইসব আলোচনাতেই ব্যস্ত ছিল সিপাহিরা। ঐ সময়ে কোম্পানির সেনাছাউনির শ্বেতাঙ্গ সৈনিকরা প্যারেড করে সন্ধের সময় চার্চে প্রার্থনার জন্য যাচ্ছিল। অনেকে বলেন তাদেরকে দেখে নাকি সেনা ক্যান্টিনের এক অল্পবয়স্ক ছেলে বাজারের দিকে 'গোরে আয়ে, গোরে আয়ে' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে একটি ভুল খবর দিয়েছিল। ভুল খবরটি এই যে, ঐ বিদেশি সৈনিকরা দেশীয় সিপাহিদের বন্দি করতে

আসছে। উত্তেজিত সিপাহিরা ছুটল সেনাছাউনির দিকে। দখল নিল সেনাছাউনির অস্ত্রাগারের। তাদের সঙ্গে যোগ দিল স্থানীয় মানুষ। আবার এমন অনেক লোকও যোগ দিল যাদের উদ্দেশ্য ছিল লুঠপাট করা। একে একে গোরা সৈন্যদের হত্যা করা হলো। মিরাটে শুরু হলো সিপাহি বিদ্রোহ।

লখনৌ-এর ব্রিটিশ রেসিডেন্সি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে রেসিডেন্সিটি সিপাহিরা আক্রমণ করেছিল। মূল ফটোগ্রাফটি রবার্ট ও হ্যারিয়েট টাইটলার-এর তোলা।

মিরাটের সিপাহিরা প্রথমে তাদের বন্দি সহকর্মীদের মুক্ত করে। তারপরে ইউরোপীয় সেনা আধিকারিকদের মেরে ফেলে সম্মিলিতভবে দিল্লির দিকে রওনা দেয়। দিল্লি পৌঁছে সিপাহিরা মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে হিন্দুস্থানের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে। ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার বিভিন্ন সেনাছাউনিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। অনেক জায়গাতেই বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে স্থানীয় কিছু অভিজাত ও সাধারণ জনগণ একজোট হয়েছিল। ফলে দ্রুতই সিপাহিদের বিদ্রোহ গণবিদ্রোহের আকার নিয়েছিল।

তবে একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ব্রিটিশ কোম্পানির সমস্ত সিপাহিবাহিনী এই

বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাহিনীর সিপাহিরা বিদ্রোহ থেকে সরে ছিল। অন্যদিকে পঞ্জাবি ও গুর্খা সিপাহিরা কার্যত বিদ্রোহী সিপাহিদের দমন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়েছিল। প্রধানত বেঙ্গল আর্মির সিপাহিরাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আসলে বেঙ্গল আর্মির মধ্যেই বেশিরভাগ ভারতীয় সিপাহি ছিল। অর্থাৎ কোম্পানির অধীনে মোট সিপাহির প্রায় অর্ধেকই ছিল বেঙ্গল আর্মিতে। সেদিক থেকে দেখলে বোঝা যায় সিপাহিবাহিনীর প্রায় অর্ধেক অংশই কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

বেঙ্গল আর্মির বেশিরভাগ সিপাহি আদতে অযোধ্যার বাসিন্দা ছিল। অযোধ্যার প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবার থেকেই কেউ না কেউ সিপাহি হিসেবে সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।

কোম্পানির তরফে যে সব সংস্কার সিপাহিবাহিনীতে করা হয়েছিল সেগুলি নিয়ে অযোধ্যাবাসী সিপাহিদের অভিযোগ ছিল। তাদের বেতন কমে যাওয়া ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ উঠেছিল। তাছাড়া ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি ঘোষণা করে যে, সিপাহিদের নিজের নিজের অঞ্চলের বাইরে

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে সি পাহিদের হাতে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ সে নাআধিকারিকের মৃত্যু। মূল ছবিটি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আঁকা।

গিয়েও কাজ করতে হবে। কিন্তু সে বাবদ আলাদা কোনো ভাতা সিপাহিরা পাবে না। এদিকে কোম্পানি শাসন ভারতীয় উপমহাদেশে যত ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ততই বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহিদের পাঠানোর প্রয়োজন হয়। এমনকি যেসব সিপাহিরা যেতে অরাজি হতো তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হতো। চাকরি সংক্রান্ত এইসব সংঘাতের সঙ্গে এনফিল্ড রাইফেলের টোটা বিষয়ক গুজবটি মিশে গিয়েছিল। ফলে ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে কোম্পানি বিষয়ে সন্দেহ ও ভয় দানা বেঁধেছিল।

নানা সাহেব

বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে অসামরিক সাধারণ জনগণ অনেক অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে থাকে। তবে যেসব অঞ্চলের মানুষজন ব্রিটিশ শাসনের সুফল ভোগ করত তারা এই বিদ্রোহে যুক্ত হয়নি। বাংলা ও পঞ্জাব ছিল সেরকম দুটি অঞ্চল। বাঙালি শিক্ষিত সমাজের অনেকেই এই বিদ্রোহকে নিন্দা করেছিল।

টুকরো কথা

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ : এক বাঙালি সরকারি চাকুরের চোখে

"..... দূরস্থ একদল সৈন্য হল্লা করিয়া উঠিল। "ভাই! খবরদার! ভাই! খবরদার!! গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" ইহার অর্থ এইরূপ ---

"ইংরেজসৈন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, খুব সতর্ক হও।"

এইবার সকলের মুখ হইতেই শুনিতে পাওয়া গেল, "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" তখন আর কাহারও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। সকলেই বিভীষিকা-গ্রস্ত হইয়া যেন হাত পা হারা হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিল, "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে।" "গোরে আয়ে, গোরে আয়ে" শব্দে যেন আকাশ, পাতাল, পৃথিবী পূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইবে তাহার কিছুই স্থির মীমাংসা দেখিলাম না।

কেবল দেখিতে লাগিলাম, রণবংশীর স্বর শুনিয়া সৈন্যগণ দলে দলে প্যারেড ভূমির দিকে দৌড়িতেছে,....।

গোরা অর্থাৎ ইংরেজ-সৈন্য আসিয়াছে শুনিয়া আমার মনে অতুল আনন্দ হইল।.... ইংরেজ-আগমনের শুভবার্তা শুনিয়া মনে মনে কতই সুখের কথা কল্পনা-জল্পনা করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ খবর পাইলাম, ইংরেজ আইসে নাই --- গোরা আক্রমণ করে নাই; সিপাহীগণের উহা কাল্পনিক ভয় মাত্র। ....

.....

..... অদ্য ১৮৫৭ সালের ১লা জুন সোমবার বেরিলির সিপাহী বিদ্রোহের একদিবস অতীত হইল --- দ্বিতীয় দিবস আসিল।”

[উদ্ধৃত অংশটি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বিদ্রোহে বাঙগালী গ্রন্থ থেকে নেওয়া। (মূল বানান অপরিবর্তিত)]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের স ময় রেলপথে সে না পাঠানোর একটি ছবি। মূল ছবিটি ইলাস ট্রেটেড লন্ডন নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত (আনু. ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ)।

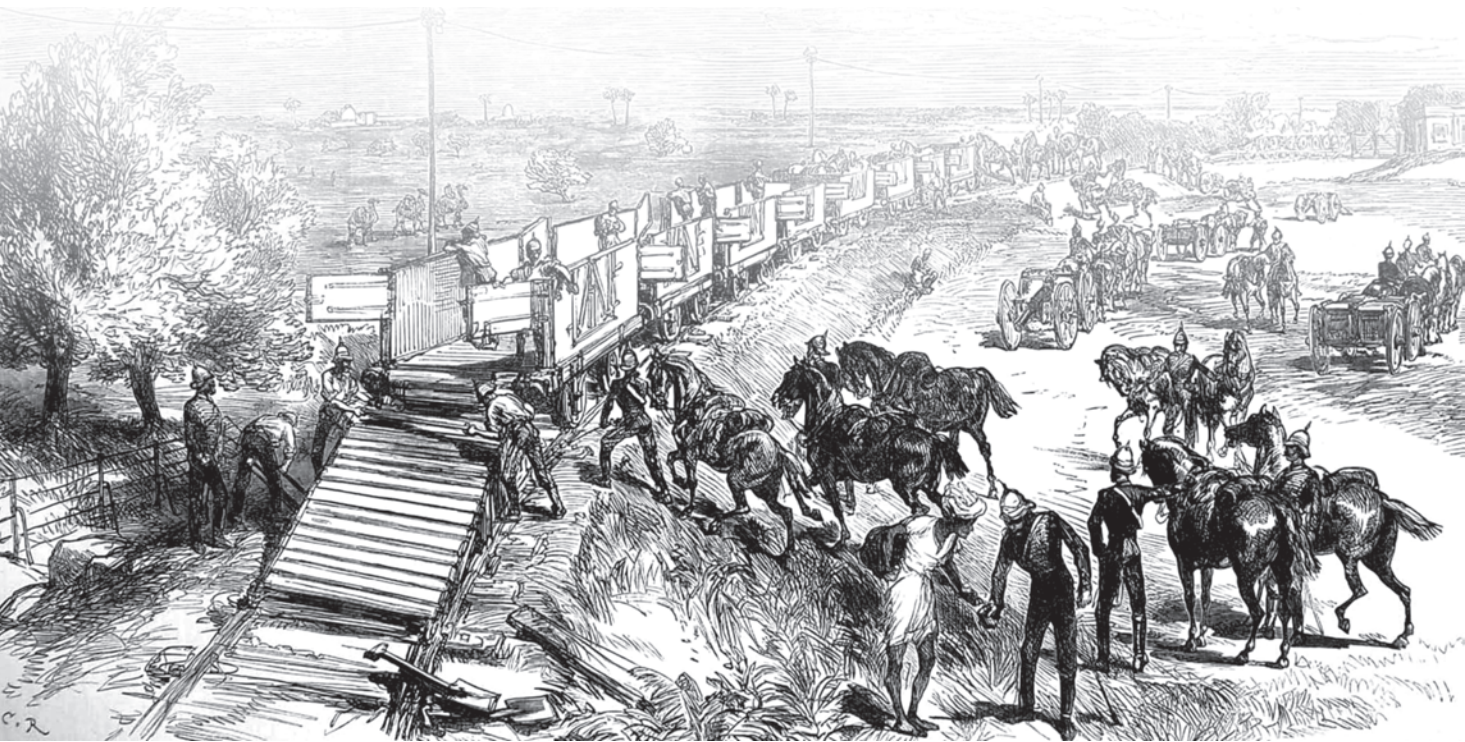

প্রায় পুরো দক্ষিণ ভারতই এই বিদ্রোহের আওতার বাইরে ছিল। অসামরিক সাধারণ জনগণ যারা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে মূলত দু-ধরনের মানুষের প্রাধান্য ছিল। বেশ কিছু সামন্তপ্রভু ও জমিদার ব্রিটিশ কোম্পানির বিভিন্ন নীতির ফলে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার হারিয়েছিল। যেমন লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে অনেক আঞ্চলিক রাজ্য কোম্পানি-শাসনের আওতায় চলে গিয়েছিল। ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলের অভিজাত সম্প্রদায় কোম্পানি-বিরোধী অবস্থান থেকে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল।

নিজে করো

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিদ্রোহগুলির বিষয়ে একটি চার্ট বানাও। চার্টে বিদ্রোহগুলির ছোটো ছোটো ইতিহাসও লিখে রাখো।

রাজস্ব-নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছিল। ফলে রাজস্বের বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে তারা ঔপনিবেশিক-শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। উঁচু হারে রাজস্ব শোধ করতে গিয়ে অনেক কৃষকই মহাজনি দেনায় আটকা পড়তে থাকে। তার ফলে কৃষকদের হাত থেকে জমি বেরিয়ে যায়। সেকারণেই বিদ্রোহী কৃষকেরা ব্রিটিশ কোম্পানির পাশাপাশি স্থানীয় মহাজনদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছিল। হারানো জমি ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ে কৃষক ও জমিদাররা কোম্পানির বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল। পাশাপাশি, বিদ্রোহ চলাকালীন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য অটুট ছিল। বস্তুত, কোনো একটি কারণের ফলে ১৮৫৭